আর কত মানুষ মরলে...
অবনি অনার্য

একটা গল্প বলি। ছোট্ট একটা ছেলে, ঘুড়ি ওড়াবার বয়স তার। মধ্য দুপুর, প্রচণ্ড গরম চারদিকে। তবু ত্বর সইছে না তার, উঠে পড়লো ছাদে। চারদিক গুমোট, একটুও বাতাস নাই। বাড়ির পাশে মসজিদ, মসজিদের সামনের খোলা জায়ড়া থেকে একটি গাছ উঠেছে একেবারে ওদের ছাদ পর্যন্ত। সবচেয়ে উঁচু এ গাছটিরও একটি পাতাও নড়ছে না। শহরের আধেকটা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে এলো। অশুভ একটা ইঙ্গিত ছেলেটার ভেতরটা ছুঁয়ে গেলো। মেঘ কালো করে এলো, বজ্রপাত শুরু হলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো দমকা হাওয়া, সঙ্গে ঝড়। ভয় করতে লাগলো তার, কিন্তু কী হয় দেখতে মন চায় তার। চারদিকে পাখিদের এলোমেলো ওড়াউড়ি, তাদেরওতো বাসায় ফিরতে হবে। অনেকেরই হয়তো বাসায় অপেক্ষা করছে ছানাগুলো, এতোক্ষণে হয়তো কাঁদতে শুরু করেছে।

ঝড়ের দমক বাড়তে শুরু করেছে আরো। ছেলেটা ভাবে, এবার নেমে যাওয়াই ভালো। কেবল নামতে যাবে, অমনি দেখে পায়ের একটু দূরেই একটা নীল রঙের ছোট পাখি ধপাস করে পড়লো। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে তাল সামলাতে পারেনি বেচারা। দৌড়ে গেলো ছেলেটা, হাতে নিলো পাখিটাকে। না, চেনা মনে হচ্ছে না; নিশ্চয়ই জঙ্গলেরই হবে। কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর নীল পাখিটা। ছেলেটা ভাবে, যেভাবেই হোক পাখিটাকে বাঁচাতে হবে। এ যাত্রায় বেঁচে গেলে একদিন সাইকেলে চড়ে দূর পাহাড়ের ধারে গিয়ে পাখিটাকে ছেড়ে দিলে নিশ্চয়ই পাখিটার খুব আনন্দ হবে। হাতের মুঠোয় পড়ে পাখিটা ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে, মুখ হা করা। একটু বৃষ্টির পানি নিয়ে পাখিটার মুখে দিতে চাইলো ছেলেটা; কিন্তু পাখিটা ভয়ে আড়ষ্ট। নিচে নিয়ে গেলো পাখিটাকে। পাখিটার থাকার একটা বন্দোবস্ত করতে গেলো ছেলেটা, পাতিলের ঢাকনাটাকেই উপযুক্ত মনে হলো। ঢাকনার নিচে যে-ই রাখতে যাবে, অমনি পাখিটা হাত ফসকে বের হয়ে গেলো। ছাড়া পেয়ে আহত পাখিটা পাগলের মতো উড়তে শুরু করলো– একবার ছাদে, একবার দেয়ালে ধাক্কা খেলো। ছেলেটাও তাড়া করা থেকে বিরত হলো, পাছে আরো বেশি ভয় পায় পাখিটা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো সে।

এমন সময় উদয় হলো বাড়ির পোষা বিড়াল। অচিরেই চোখ গেলো পলায়নপর পাখিটার দিকে। আহারের দারুণ বন্দোবস্ত ভেবে চোখে চোখে রাখলো পাখিটাকে। ছেলেটাও বুঝতে পারলো বিড়ালের উদ্দেশ্য। বিড়ালটাকে তাড়া করলো সে। বিড়ালও লাফ দিয়ে উঠে পড়লো আলমারির উপর। ছেলেটা তাড়া করতে থাকলো বিড়ালকে, আর বিড়াল পাখিটাকে। এক সময় পাখিটার প্রতি থাবা ছুঁড়তে সক্ষম হয় বিড়াল, ধরেও ফেলে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিড়ালের গায়ে লাথি কষায় ছেলেটা, পাখিটা মুক্ত হয় বিড়ালের হাত থেকে। দৌড়ে গিয়ে পাখিটাকে হাতে তুলে নেয় ছেলেটা; কিন্তু ততোক্ষণে পাখিটার ঘাড় নুয়ে পড়েছে ছেলেটার হাতে।

প্রচণ্ড জেদ চাপে ছেলেটার, বিড়ালটাকে একটা দারুণ শিক্ষা দেবার ক্ষোভ ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠতে থাকে। এতোক্ষণ সে বিড়ালটাকে তাড়া করেছে স্রেফ ওর হাত থেকে পাখিটাকে বাঁচাবার জন্য, এবার সত্যি সত্যি মেরে ফেলার জন্য। তাড়া করতে করতে একপর্যায়ে বিড়ালটাকে কোনঠাসা করে ফেলে। বিড়াল বুঝতে পারে ছেলেটার চোখে আছে খুন, বিড়ালও তাই লড়বার সিদ্ধান্ত নেয়। ছেলেটা বুঝতে পারে বিড়ালের চোখের ভাষা। তাই কিছুটা বিব্রত হয়, ততোক্ষণে লাফ দিয়ে বিড়ালটা ছেলেটার ঘাড়ে উঠে আবার লাফ দেয় ভেন্টিলেটর লক্ষ্য করে। সর্বশক্তি পয়োগ করে মৃত্যুকে রুখবার লাফ, তাই আপাতভাবে সম্ভব না হলেও বিড়ালটা সক্ষম হয় ভেন্টিলেটরে পৌঁছাতে। পালিয়ে যায় বিড়ালটা। আবার তাড়া করে বিড়ালটাকে। পাশের মসজিদের বিশাল দেয়াল লাফ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে যায় বিড়ালটা। তারপর কী হয় জানে না ছেলেটা, তবে বিড়ালটার মৃত্যু হয়েছে এটা জানা যায়।

আপাত দৃষ্টিতে গল্পটা শাদামাটা হলেও, আসলে অতোটা শাদামাটা নয়। সাধারণ একটা ছেলে, যার আকাশে ঘুড়ি ওড়াবার বয়স, নীল একটা পাখির প্রতি দরদী হবার মতো সরল, নির্দোষ, সেই ছেলেটা কেন হঠাৎ করে এতোটা মারমুখী, খুনী হয়ে ওঠে– সেটা ভাববার বিষয় বটে। গল্পটার আখ্যানভাগ পৃথিবীর যেকোনো জায়গা হতে পারে। কিন্তু, প্রকৃত গল্পটা বার্মার। বার্মার মানুষের দীর্ঘ সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা আছে, সেখানকার লেখকদের গল্পেও সেটা বারবার উঠে আসে। ছোট্ট পাখিটাকে এখানে গণতন্ত্র, মানুষের স্বাধীনতার রূপক আকারে দেখানো হয়েছে। ছোট্ট ছেলেটার মতো সাধারণ নিরপরাধ মানুষ সেটাকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু বিড়ালটা যেমন বাড়ির পোষা, ঠিক তেমনই আমাদের অত্যন্ত পরিচিত, চেনামুখ, দেশীয়, আমাদের অর্থে পোষা কেউ সেই গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতাকে খুন করতে যায়। কিন্তু ইতিহাস বলে, সাধারণ মানুষ যেমন নিজের অর্থে পোষা দেশরক্ষী বাহিনীর নামে প্রকৃতঅর্থে বিদেশরক্ষী বাহিনীর হাতে হাসিমুখে মরতে জানে, ঠিক তেমনই তাদেরকে মারতেও জানে। চেনা মুখ, হাসি হাসি মুখ, ডক্টরেট, পোষা মানেই যে আমাদের বন্ধু নয়, সেটাও ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

গল্পটা বার্মার বলে আমরা প্রচণ্ড আহত হলেও, খুব একটা অবাক হই না, যেমন একই গল্প যদি বাংলায় হতো ৭৫-পরবর্তী সময় থেকে '৯০-এর স্বৈরাচার শাসনের কালে, তাহলেও অবাক হবার কিছু ছিলো না। কিন্তু একাত্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একবার স্বাধীন হবার পরও মানুষ মরেছে অসংখ্য দেশের বর্বর সামরিক শাসনের হাত থেকে দেশ বাঁচানোর জন্য। দেশে তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরও কানসাট, ফুলবাড়িতে এই যে মানুষ মরছে অবিচারে, এর ফল একদিন শাসকগোষ্ঠি পাবে, নিশ্চয়ই পাবে। মানুষ যখন সত্যিকারের সচেতন হবে, মরিয়া হয়ে উঠবে, তখন রক্ষা হবে না করো, এমনকি দেবালয়েরও। বব ডিলানের মতো প্রশ্ন করা যায়– আর কতো আর মানুষ মরলে বুঝবে তুমি/ মানুষ মরেছে ঢের...

এতো মানুষ হত্যার ঘটনা ভুলে যাবার জন্য সেখানে যদি অসংখ্য প্রমোদউদ্যানও বানানো হয়, মানুষ এসব ভুলবে না। বার্মার আরো একটি গল্প এরকম– বিদ্যুৎ চলে গেলে বস্তির বাচ্চাগুলো চাপা গলির সরু রাস্তাজুড়েই চিৎকার, চেঁচামেচিতে মেতে ওঠে। কিন্তু, কখনো সাইকেল-গাড়ি চলাচল করে; তাছাড়া ওটার পেছনেই আছে বিষাক্ত সাপ, বিছা ইত্যাদি। তাই একদিন গল্পের এক মা (আসলে লেখিকা নিজেই)সব বাচ্চাকে ডাক দেয়। বলে, চলো সবাই মিলে খেলি গিয়ে পাশের পার্কে। কিন্তু বাচ্চারা কেউ যেতে চায় না। মা তো অবাক, ওখানে কত সুন্দর খেলনা, সবুজ ঘাস, কতো সুন্দর ফুল। কেন যাবে না! সবাই একবাক্যে বললো, ওখানে সবাই ওদের মৃত বন্ধুকে দেখতে পায়। কিন্তু ভুত-প্রেত বলে কিছু নেই– এসব বোঝাতে যায় মা। বাচ্চার বুঝতে চায় না। একজন বলে, আমি সত্যি সত্যিই দেখতে পাই, লাল ঙের জামা গায়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। মা তখন বললেন, কিন্তু মরার সময় তো ওর গায়ে ছিলো শাদা জামা। তবু বাচ্চারা শেষমেশ যাবে না, যাবেই না।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, বার্মার সেনাবাহিনী এক শিক্ষকের ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেতরেই চা পানরত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। ওর গায়ে ছিলো শাদা জামা, রক্তে সেটা লাল হয়ে যায়। হত্যার ঘটনা সাধারণ মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলবার জন্য শাসকশ্রেণী এরকম সাধারণ মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্মৃতিশক্তিও সাধারণ– এটা কে বলেছে! ওরা ভোলে না, ভোলে না কিছুই। তিলে তিলে সবকিছুর হিসাব হবে। হিসাব হবে এ-বঙ্গেই।

aunarjo@gmail.com